জীবনে যা দেখলাম

পঞ্চম খণ্ড (১৯৭৫-১৯৮৪)

[৯ খণ্ডে সমাপ্ত]

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন - ঢাকা

সূচিপত্র

'৭৫ সালের বাদশাহ ফায়সাল প্রসঙ্গ ১৫
বাদশাহ খালেদের সাথে সাক্ষাৎকার ১৬
জর্ডান সফর ১৭
বাংলাদেশে আগস্ট বিপ্লবের পর আমার ভাবনা ২০
'৭৫-এর নভেম্বর বিপ্লব ২১
বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ২১
ইংল্যান্ডে গ্রীষ্মকালীন সম্মেলন ২২
১৯৭৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের লক্ষ্য ২৩
শেখ হাসিনার ক্ষমতা ত্যাগ ২৫
নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ২৫
নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার বিস্ময়কর আচরণ ২৬
শেখ হাসিনার পুনর্নির্বাচন দাবি ২৭
শেখ হাসিনার ক্ষমতায় আসার সুযোগ ২৮
জামায়াতে ইসলামীর সংকট ২৮
এ আন্দোলনই আওয়ামী লীগের সৌভাগ্যের ভিত্তি ২৯
নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আরও কারণ ৩০
কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের ভূমিকা ৩১
বিদেশী পর্যবেক্ষকদের অভিমত ৩১
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে প্রেরিত রিপোর্ট ৩৩
জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারিয়ানস এসোসিয়েশনের
পক্ষ থেকে প্রেরিত রিপোর্ট ৩৪
বিচারপতি লতিফুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রেরিত চিঠি ৩৫
সেনাপ্রধানের চিঠি ৩৬
আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের অভিনন্দনপত্র ৩৭
দেশীয় পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার স্বীকৃতি ৩৯
বিচারপতি লতিফুর রহমানের সাথে আমার একান্ত সাক্ষাৎ ৪০
অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি ৪১
কেয়ারটেকার সরকারের সংজ্ঞা ৪১
বাংলাদেশের নির্বাচন ৪২
অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার ৪৩
জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে
কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবি উত্থাপন ৪৪
স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ৪৪

সংলাপে জামায়াতের লিখিত দাবি ৪৮
মেজর জেনারেল মইনুল হোসেনের বক্তব্যের বিশ্লেষণ ২১৬
ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার উদ্যোগ ২১৬
বই বিলির ব্যবস্থা হলো ২১৭
কমিটি গঠিত হলো ২১৯
ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রতিষ্ঠা সম্মেলন ২২০
ঐতিহাসিক উদ্বোধনী ভাষণ ২২১
ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ এক ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যমঞ্চ ২২২
কেন্দ্রীয় মজলিসে সাদারাতের সদস্যবৃন্দ ২২৩
সম্মেলনে যারা বক্তব্য রাখেন ২২৪
ইত্তেহাদুল উম্মাহর কর্মসূচি ২২৪ প্রাথমিক পাঁচ দফা কর্মসূচি ২২৫
ইত্তেহাদুল উম্মাহর মূলনীতি ২২৬
সম্মেলনের সাফল্যে পরম তৃপ্তিবোধ করলাম ২২৭
মাওলানা সাঈদীর বিশেষ বিবরণ ২২৭
ইত্তেহাদুল উম্মাহর অগ্রগতি ২২৯
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়ল ২৩০
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থীগণ ২৩০
নির্বাচনী প্রচারাভিযান ২৩১
নির্বাচনের প্রচারাভিযানে সহযোগিতার অনুরোধ ২৩২
নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের বক্তব্য ২৩২
নির্বাচনী ফলাফল ২৩৩
নির্বাচনে অন্য প্রার্থীদের হাল ২৩৩
নির্বাচনোত্তর সরকার গঠন ২৩৪
সেনাপ্রধানের রাজনীতি চর্চা ২৩৫
সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব ২৩৯
বিচারপতি আবদুস সাত্তারের দুর্বলতার সুযোগ ২৪০
প্রেসিডেন্টের আত্মসমর্পণ ২৪১
প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধানের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ২৪২
এরশাদের ক্ষমতা দখল ২৪২
প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারের চরম অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা ২৪৫
সেনা-অফিসারদের মধ্যে বিভেদ ২৪৬
এরশাদ সম্পর্কে কতক তথ্য ২৪৭
প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যা ও জেনারেল মঞ্জুর হত্যা ২৪৮
জিয়া হত্যার জন্য দায়ী কে ২৪৯
মঞ্জুর হত্যার জন্য দায়ী কে ২৫১
অভিনেতার ভূমিকায় এরশাদ ২৫৩

১৭৭.

'৭৫ সালের বাদশাহ ফায়সাল প্রসঙ্গ

১৯৭৫ সালের আলোচনায় দুটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে শেখ মুজিব হত্যা সম্পর্কে 'জীবনে যা দেখলাম' চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাদশাহ ফায়সাল নিহত হওয়ার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হলেও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এখন আলোচনা করছি।

আমি তখন লন্ডনে। বাদশাহ ফায়সাল ক্ষমতাসীন থাকাকালে প্রিন্স খালেদ ক্রাউন-প্রিন্স পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি বাদশাহ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে বাদশাহ ফায়সালের নীতি আমার ভালোভাবেই জানা ছিল। বাদশাহ খালেদ বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর ভাইয়ের পলিসিতে কোন পরিবর্তন করবেন কি-না তা জানার জন্য সৌদি আরব যাওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে উল্লেখ থাকায় বাদশাহ ফায়সালের আমলে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এ নীতির ব্যাপারে বাদশাহ খালেদের সিদ্ধান্ত জানার উদ্দেশ্যে ১১ মে (১৯৭৫) সৌদি আরব গেলাম।

সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য বাদশাহ ফায়সালের মন্ত্রিসভার এককালীন মন্ত্রী শায়খ আহমদ সালাহ জামজুমের সাথে দেখা করলাম। তিনি রাজধানী রিয়াদে যোগাযোগ করে জানালেন, বাদশাহ খালেদ সারা দেশে বাইআত গ্রহণের জন্য সফরে যাচ্ছেন। সফরের এক পর্যায়ে তিনি জেদ্দায় আসবেন। ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি চিফ প্রটোকল অফিসার জনাব আবদুল ওয়াহাবকে জানিয়ে রাখলেন, যাতে যথাসময়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে বাদশাহ ফায়সালের সাথে আমার দু'বার সাক্ষাতের সময় তিনি দোভাষীর দায়িত্বও পালন করায় আমার কথা তাঁর মনে আছে বলেও শায়খ জামজুমকে বললেন।

জানা গেল, জুনের শেষ সপ্তাহে বাদশাহ জেদ্দায় পৌঁছবেন। হিসাব করে দেখলাম, পাঁচ সপ্তাহ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়টা মক্কা ও মদীনা শরীফে এক সপ্তাহ করে থেকে রাজধানী রিয়াদ ও শীতকালীন রাজধানী তায়েফ সফর করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সৌদি সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে তখনও সৌদি আরবে বাংলাদেশীদের চাকরি উপলক্ষে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। শুধু হজ্জের সময়ে মিসর দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশী হাজীদের যাওয়ার ব্যবস্থা হতো।

কিন্তু, মক্কা, জেদ্দা, মদীনা, রিয়াদ, তায়েফ ও অন্যান্য সৌদি শহরে পাকিস্তানি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশার লোক বেশ সংখ্যায় চাকরিরত ছিল। এসব পেশায় ইতঃপূর্বে মিসরীয়রাই বেশি ছিল। মিসরের সামরিক স্বৈরশাসক জামাল নাসেরের আরব-জাতীয়তাবাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে মিসরীয়দের স্থানে সৌদি সরকার পাকিস্তানিদের অগ্রাধিকার দেয়। পাকিস্তানি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষকদের মধ্যে যারা

জামায়াতে ইসলামীর লোক ছিলেন তারা সংগঠিত হয়ে দীনী চর্চা করতেন। আমি সৌদি আরবে গেলে তারা আমাকে তাদের কর্মী বৈঠকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দিতেন। সাংগঠনিক ও তারবিয়্যাতী কর্মসূচিতে আমাকে পেলে তারা অত্যন্ত উৎসাহিত হতেন। আমিও দীনী কাজ পেয়ে খুশি হয়ে তাদের সময় দিতাম।

আমার এ সফরে পাঁচ সপ্তাহ সময় বেকার আছি জানতে পেরে তারা মক্কা, মদীনা, জেদ্দা, রিয়াদ ও তায়েফে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে আমাকে রীতিমতো কর্মব্যস্ত রাখলেন। তা ছাড়া মক্কায় রাবেতা আলমে ইসলামী ও রিয়াদে ওয়ামী (WAMY - World Assembly of Muslim Youth) নামক সংস্থার দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাৎ এবং বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে যোগাযোগের সুযোগও পেলাম।

বাদশাহ খালেদের সাথে সাক্ষাৎ

২৬ জুন (১৯৭৫) জেদ্দা রাজপ্রাসাদে বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আযীযের সাথে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। আমি আরও দু'জন বাংলাদেশী দীনী ভাইকে সাথে নিয়ে গেলাম। তাদের একজন মরহুম ব্যারিস্টার আখতারুদ্দীন আহমদ। তিনি তখন সৌদি এয়ারলাইন্সে আইন উপদেষ্টা হিসেবে চাকরিরত। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের শাসনামলে বেসিক ডেমোক্রেসি সিস্টেমে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে জামায়াতের যে চারজন পাকিস্তান পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার সাহেব অন্যতম। তাদের মধ্যে জনাব আব্বাস আলী খান গ্রুপ-লিডার এবং ব্যারিস্টার সাহেব সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করতেন। অপর দু'জন ছিলেন জনাব শামসুর রহমান ও মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।

বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সময়ে আরেকজন ছিলেন ঢাকাস্থ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস চ্যান্সেলর মরহুম ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ। তখন তিনি জেদ্দায় কিং আবদুল আযীয ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি মক্কায় উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন।

যথাসময়ে রাজপ্রাসাদে পৌঁছলে চিফ প্রটোকল অফিসার আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বাদশাহর দরবারে নিয়ে গেলেন। আমরা সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে হাত বাড়ালেন। আমরা মুসাফাহা করলাম। তিনিই ইশারায় বসতে বললেন। প্রটোকল অফিসার আমাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, এঁরা বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি। তিনি আমার পরিচয় দিয়ে জানালেন, ইতঃপূর্বে দু'বার আমি শহীদ বাদশাহ ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি আমার দু'সাথীর পরিচয় দিলাম। তাঁরা দু'জনই সৌদি আরবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন শুনে বাদশাহ খুশি হলেন।

আমি বাদশাহ ফায়সালের সাথে আলোচনার সারকথা তাঁকে অবহিত করলাম এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে শহীদ বাদশাহর নীতি উল্লেখ করে বললাম, বাংলাদেশে সৌদি দূতাবাস না থাকায় হজ্জযাত্রীদের হজ্জে পাঠাতে বাংলাদেশ সরকারকে অত্যন্ত কঠিন

সমস্যায় পড়তে হয়। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র সংশোধন করার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনার সরকার কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে সরকারকে বাধ্য করতে পারলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানার জন্যই আমরা হাজির হয়েছি।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার মরহুম ভাইয়ের গৃহীত পলিসিকেই আমি সঠিক মনে করি। আপনারা যে কূটনৈতিক চাপের কথা বলছেন, আমাদের এ পলিসির তা-ই উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ যদি সৌদি আরবের স্বীকৃতি সত্যিই জরুরি মনে করে, তাহলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করাও জরুরি মনে করবে। আমরা সে অপেক্ষায়ই আছি।

আমি বললাম, আমরা আশঙ্কা করি যে, চীন ও সৌদি আরব স্বীকৃতি না দিলে বাংলাদেশে ভারত আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা করতে পারে। বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে ভারত যে ভূমিকা পালন করেছে তাতে আধিপত্য বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মযবুত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক, তা ভারত চায় না। ভারত বাংলাদেশকে যেসব চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে তা থেকে ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

তিনি বললেন, তোমাদের সরকার যদি স্বাধীনচেতা না হয় তাহলে বাইরের কোন শক্তি তোমাদের সাহায্য করতে পারবে না। সরকার যদি জনগণকে সাথে নিয়ে বলিষ্ঠ মনোভাব পোষণ করে, তাহলে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

আমাদেরকে সাক্ষাতের সময় দান করার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানিয়ে বিদায় হলাম।

সেখান থেকে বের হয়ে আমরা তিন জন বলাবলি করলাম, জনগণ তো শেখ মুজিবের সাথে নেই। তাহলে তাঁর পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কেমন করে সম্ভব হবে?

সৌদি আরবে এ সফরের আসল উদ্দেশ্যই ছিল বাদশাহর সাথে দেখা করা। তাই এর কয়েকদিন পরই লন্ডন যাওয়ার পথে জর্ডান গেলাম। রাজধানী আম্মানে চার-পাঁচ দিন থেকে ৭ জুলাই লন্ডন পৌঁছলাম।

জর্ডান সফর

রাবেতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনের বিবরণে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সেখানে জর্ডানের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি এলেন তিনি পুরনো বন্ধু শায়খ কামিল আল-শরীফ। তিনি পাকিস্তানে জর্ডানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং ১৯৭২ সালে আমি পাকিস্তানে আটকা পড়ার সময় ইসলামাবাদে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অবশ্য ১৯৭১ সালে ঢাকা আসায় তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল। তাঁরই উদ্যোগে ইসলামাবাদে যোগাযোগ হয়।

১৯৭৪ সালে রাবেতার সম্মেলনে তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, ফিলিস্তিনকে ইসরাঈলের দখল থেকে মুক্ত করার আন্দোলনে তিনি জর্ডানে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এ উদ্দেশ্যে আল-কুদস্ কমিটির তিনি আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি একটি

প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও ঐ আন্দোলনে বিরাট অবদান রাখেন। তিনি রাবেতা'র সম্মেলনে আমাকে দাওয়াত দিলেন জর্ডান যাওয়ার জন্য। সে দাওয়াতে এ সময় সাড়া দিয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি জানালেন, আম্মান বিমানবন্দরে এলে ভিসার ব্যবস্থা হবে।

২ জুলাই আম্মান পৌঁছলাম। বিমানবন্দরে কামিল আল-শরীফ ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছেই পৌঁছে গেলেন। তিনি ইতঃপূর্বে জর্ডান সরকারের আওকাফ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সর্বমহলে অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি। আম্মানের একটি হোটেলে তাঁর মেহমান হিসেবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো।

তখন জর্ডানের বাদশাহ ছিলেন হোসাইন। তাঁর দাদা শরীফ হোসাইন বর্তমান সৌদি আরবের বাদশাহ ছিলেন। তিনি সৌদি আরব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীযের ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তুর্কি খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাসক হিসেবে টিকে থাকেন। বাদশাহ আবদুল আযীয ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের সহযোগিতায় ইসলামী বিপব সাধন করে বাদশাহ শরীফ হোসাইনকে উৎখাত করেন এবং সৌদি আরব নামে নতুনভাবে রাষ্ট্র কায়েম করেন। ইংরেজরা শরীফ হোসাইনের আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলে কিছু বিরান এলাকা ও ফিলিস্তিনের কিছু অংশ নিয়ে ট্রান্স-জর্ডান নামে একটি ছোট্ট রাষ্ট্র কায়েম করে সেখানে তাকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। বর্তমান বাদশাহ (২০০৪) আবদুল্লাহ বাদশাহ হোসাইনে ছেলে।

ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালে আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেন প্রাচীনকাল থেকে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ আরব মুসলমানকে তাদের বসত-বাড়ি ও জমি-জমা থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করে সেখানে 'ইসরাঈল' নামে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করে। বিতাড়িত মুসলমানরা নিকটবর্তী রাষ্ট্র হিসেবে জর্ডান ও লেবাননে আশ্রয় নেয়। জর্ডানে মুহাজির কলোনি নামে কয়েকটি ফিলিস্তিনি বসতি আমাকে দেখানো হয়। সরকার সাধ্যমতো তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু এত লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়নি। তাই লেবানন ও জর্ডান থেকে বহু ফিলিস্তিনি বিভিন্ন আরব দেশে চাকরির তালাশে যেতে বাধ্য হয়েছে।

আমি কামিল আল-শরীফকে জিজ্ঞেস করলাম, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের নেতা ইয়াসির আরাফাত সেক্যুলার রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন করছেন বলে বারবার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর সমর্থনও চান। এ ঘোষণা কি সমর্থন পাবে? তিনি এ আন্দোলনের ইতিকথা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, "ফিলিস্তিনের জনগণ ইসরাঈল রাষ্ট্রকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিল। আল-কুদস্ কমিটি মুজাহিদদেরকে সাহায্য করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিল। এ বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার জন্য একটি ডেলিগেশন সৌদি বাদশাহ ফায়সালের নিকট গেল।

আমাকে ডেলিগেশনের লিডারের দায়িত্ব দেওয়া হলো। বাদশাহ ফায়সাল অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমার বক্তব্য শোনার পর বললেন, আমার নিকট তোমাদেরকে দেওয়ার মতো অস্ত্র নেই। তোমরা আমার কাছ থেকে যত টাকা প্রয়োজন নিতে পার। অস্ত্র কোথা থেকে কিনবে তা তোমাদের ব্যাপার। তবে তোমরা আমেরিকা থেকে পাবে না। ইসরাঈলের বিরোধীদের নিকট তারা অস্ত্র বিক্রয় করবে না। রাশিয়ার কাছে যেতে পার।

আমরা রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলে যোগাযোগ করলাম। তারা বলল, আপনাদের তো আমরা চিনি না। ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আমরা অমুক-অমুককে চিনি। তাদের আসতে বলুন। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। তারা যাদের নাম বলেছে, তারা বামপন্থি নেতা। এর মানে হলো, তারা রাশিয়ার নিয়োগপ্রাপ্ত এজেন্ট হিসেবে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রচারক। আল-কুদস্ কমিটির অধিকাংশই ইসলামপন্থি ও অন্যরা স্বাধীনতাকামী। এর মধ্যে একজনও বামপন্থি নন। কারণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে যারা বিবেচ্য তাদের কেউ বামপন্থি নন।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (PLO) লিডার পদের জন্য সাহসী ও ত্যাগী মনোভাবসম্পন্ন নেতা হিসেবে ইয়াসির আরাফাতকে সবাই সমর্থন করল। ইসলামপন্থিরাও আরাফাতকে অপছন্দ করেনি। PLO গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাদের অস্ত্রের অপরিহার্যতা বিবেচেনা করে আমরা বাধ্য হয়েই রাশিয়ার এজেন্টদের মাধ্যমেই অস্ত্র সংগ্রহ করলাম। এভাবেই PLO-এর নেতৃত্বে বামপন্থিরা গুরুত্বপূর্ণ পজিশন পেয়ে গেল। তাদেরই চাপে ইয়াসির আরাফাত বারবার সেক্যুলার রাষ্ট্র কয়েমের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছেন। ইয়াসির আরাফাত ইসলামপন্থিও ছিলেন না, বামপন্থিও ছিলেন না।"

এ বিবরণ শুনে আমি বললাম, বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য কায়েম হওয়ার আশঙ্কায় মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থিদের কতক লোকের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ করার চিন্তা-ভাবনা চলছিল। আমি এ চিন্তার বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করায় তারা আর অগ্রসর হয়নি। তিনি মন্তব্য করলেন, ইসলামপন্থিদের কখনও এ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নয়।

আমার মেযবান কামিল আল-শরীফ ইখওয়ানুল মুসলিমূনের সংগঠনভুক্ত না হলেও ইখওয়ানীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। আমি তাদের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তাঁর অফিসেই ইখওয়ান নেতাদের সমবেত করলেন। আমার ধারণা ছিল, ইখওয়ানীদের সংগঠন সকল আরব দেশেই আছে বটে; কিন্তু কোন দেশেই প্রকাশ্য তৎপরতার সুযোগ দেওয়া হয় না। আম্মানে ইখওয়ানী নেতাদের কাছ থেকে জানা গেল, একমাত্র জর্ডানেই ইখওয়ানুল মুসলিমূন প্রকাশ্যে কাজ করছে এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করছে। জর্ডানে রাজতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও দলীয় ভিত্তিতে পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়। কুয়েতে পার্লামেন্ট নির্বাচন হলেও রাজনৈতিক-দলীয় ভিত্তিতে কোন তৎপরতার অনুমতি নেই। ঐ সময় সুদানে জেনারেল নুমেরীর স্বৈরশাসন চলছিল। বর্তমান (২০০৪ সালে)

সুদানে ইসলামী সরকার কায়েম থাকলেও ইখওয়ানুল মুসলিমূন সরকারে শামিল নেই। তবে ইখওয়ান প্রকাশ্য তৎপরতা চালাচ্ছে।

আম্মানে কয়েকদিন ইখওয়ানী ভাইয়েরা ছাড়াও কামিল আল-শরীফের উদ্যোগে অনেক বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়। সে দেশের উল্লেখযোগ্য ইসলামী নেতৃবৃন্দের নিকট জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পরিচিতি তুলে ধরার সুযোগ পেলাম।

বাংলাদেশে আগস্ট বিপবের পর আমার ভাবনা

আগস্ট বিপবের পর আমার মনে আশার সঞ্চার হলো যে, আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনের অবসান হতে পারে। জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়ে যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদের সাথে ছাত্রজীবন থেকে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক জীবনেও যা বহাল রয়েছে তাতে আশা করা যায়, দেশে ফিরে যাওয়ার পথে যে বাধা রয়েছে তা দূর হয়ে যাবে।

মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে আমার চাচা মরহুম শফীকুল ইসলাম ও খন্দকার মুশতাক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। চাচার বন্ধু হিসেবে তাঁকেও আমি চাচা ডাকতাম। তারা দু'জনই বয়সে আমার মাত্র তিন বছরের বড় ছিলেন। খন্দকার সাহেবও আমাকে আদর করে 'চাচা মিয়া' বলেই ডাকতেন। তবে 'তুমি' সম্বোধনই করতেন।

আমি তাঁকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। তাতে অনেক পরামর্শ ছিল। সর্বশেষে আমার নাগরিকত্ব সমস্যার কথাও ছিল। চিঠি ডাকে পাঠানোর পূর্বেই বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে কর্মরত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত এক অফিসার থেকে জানা গেল, জনৈক মেজর প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রয়োজনে লন্ডন এসেছেন। আমার চিঠিটি তাঁর হাতে দিলে দু-তিন দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে বলে আশ্বাস দিলেন।

আমি ঐ চিঠির জবাবের আশায় ছিলাম। মুশতাক সাহেব নভেম্বরের ৫ তারিখ ক্ষমতা হারানোর পর মনে করলাম, হয়তো আমার চিঠির জবাব দেওয়ার সময়-সুযোগ পাননি। '৭৮ সালে দেশে এসে তাঁর আগামসীহ লেনের বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারলাম, আমার চিঠি তাঁকে দেওয়াই হয়নি।

এক বছর আগে '৭৪ সালের আগস্ট মাসে মাওলানা মওদূদী (র)-এর সাথে লন্ডনে যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বলেছিলেন, যদি দেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে আফ্রো-আমেরিকানদের মধ্যে ইসলাম প্রসারের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আমি তাঁর পরামর্শ বিবেচনা করছিলাম। আগস্ট বিপবের পর সে পরামর্শ আর বিবেচনাযোগ্য মনে করিনি। তাছাড়া আমি প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিদেশ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করছিলাম তা আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশে ফিরে আসার সুযোগ না পেলেও আমি হয়তো এ কাজেই বাকি জীবন নিজেকে নিয়োজিত রাখার প্রয়োজনবোধ করতাম।

১৭৮.

'৭৫-এর নভেম্বর বিপব

লন্ডনে ৪ নভেম্বরের পত্রিকায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী-প্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করেছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়। আগস্ট বিপবের নেতারা ৩ তারিখ দিবাগত রাতেই বিদেশে চলে গেছেন৷এ খবরও একই সাথে প্রকাশিত হয়। আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, আগস্ট বিপবের বিরুদ্ধে এটা প্রতিবিপব। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, ভারতপন্থিরাই এ বিপব সাধন করেছে। তাদের পেছনে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা আছে বলেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। লন্ডনে আওয়ামী লীগের সমর্থক মহলে কিছুটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি রীতিমতো উদ্বেগ অনুভব করি।

চীন ও সৌদি আরব তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। আমি সৌদি আরবের বাদশাহ খালেদকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানাই। সেই সাথে এ আশঙ্কাও প্রকাশ করি৷ভারত যাতে সরাসরি বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, সেদিকেও যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে সম্বোধন করে একটি আবেদনপত্র লন্ডনস্থ চীনা দূতাবাসে গিয়ে রাষ্ট্রদূতের হাতে দিয়ে আসি। সে আবেদনপত্রেও ভারতের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যে কয়টি বাংলাদেশকে আগেই স্বীকৃতি দিয়েছে, সেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকটও ভারতের আধিপত্যের শঙ্কা প্রকাশ করে আবেদন জানাই। আমার আবেদনের মূল্য থাকুক আর না-ই থাকুক এর চেয়ে বেশি কিছু করার সাধ্য না থাকায় আবেদন জানিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা বোধ করেছি। এরপর কয়েক দিন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন খবর না পেয়ে চরম উদ্বিগ্ন অবস্থায় কাটিয়েছি। ৮ নভেম্বরের পত্রিকায় জেনারেল জিয়াউর রহমান আবার সেনাপ্রধান পদে বহাল হওয়া ও খালেদ মোশাররফের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে বিশেষ করে সিপাহি-জনতার সম্মিলিত মিছিলের খবরে ধারণা করলাম, বড় বিপদ কেটে গেছে। এরপর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যা কিছু ঘটেছে তার কিছুই জানা ছিল না। তাই উদ্বেগমুক্ত মন নিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হলাম।

বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ

লন্ডনস্থ সৌদি দূতাবাস থেকে জানা গেল, সৌদি সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু শাসনতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বাতিল না করা পর্যন্ত বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হবে না। এ কথা জানা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যখনই সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয় ইসলামকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার মতো ব্যক্তি যেন নিয়োগ পান সে উদ্দেশ্যে লবি করার জন্য সৌদি আরবে গেলাম। লবি করার জন্য আমার নিকট প্রধান ব্যক্তি শায়খ আহমদ সালাহ জামজুম, যিনি ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে আমাকে বাদশাহ ফায়সালের কাছে নিয়ে যান। আমি তার সঙ্গে দেখা করে আমার উদ্দেশ্য তার নিকট ব্যক্ত করলাম। তাকে

জানালাম, গত বছর জেদ্দায় অবস্থিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইসলামী এ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতীবের সাথে পরিচয় হয়। আমার ধারণা, এ মানের লোক বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ইসলামের পতাকাবাহী হিসেবে সৌদি আরবের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের ইসলামী মহল অত্যন্ত উৎসাহবোধ করবে। তিনি বললেন, আমি খোঁজ-খবর নিচ্ছি, দু-এক দিন পর আবার আসেন। আমি আরও কয়েকজন ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, যাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা যে, এ বিষয়ে তারা সাহায্য করতে পারেন। দু'দিন পর শায়খ জামজুমের কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, ফুয়াদ আল খতীব এখনও এম্বাসেডর র‍্যাংকের নিচে আছেন। তবে আমি যে মানের লোক বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কামনা করি, ফুয়াদ আল খতীব ঐ মানের লোক বলে তিনি মন্তব্য করলেন। বাংলাদেশ সরকার তখন পর্যন্ত শাসনতন্ত্র সংশোধন করেনি বলে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগে বিলম্ব হবে ভেবে আমি এ ব্যাপারে আর বেশি লবি করা প্রয়োজন মনে করলাম না এবং আর কারো কাছ থেকে বিকল্প নামও যোগাড় করা গেল না। যাদের কাছে লবি করার জন্য গেলাম তারাও এ কথাই বললেন যে, সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগের শর্ত পূরণ হলে তারা এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবেন; এর আগে লবি করে কোন লাভ নেই। তাই আমি লন্ডনে ফিরে গেলাম।

ইংল্যান্ডে গ্রীষ্মকালীন সম্মেলন

ইংল্যান্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রায় দু-তিন মাস বন্ধ থাকে তখন সেখানকার ইসলামী ও অন্য সকল সংগঠন এবং সংস্থা ব্যাপকভাবে সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। ইতঃপূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী সংগঠনগুলো তাদের সম্মেলনে আমাকে অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৭৫ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে এ জাতীয় তিনটি সম্মেলনে আমি আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে যোগদান করি। ১৮ জুলাই ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে FOSIS (Federation of Students Islamic Societies)-এর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই 'ইসলামিক সোসাইটি' নামে ছাত্রদের সংগঠন আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এসব সংগঠনের জন্য কিছু টাকাও বরাদ্দ করা হয়। এ রকম ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটিও আছে, যাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। এ সকল ইসলামী সোসাইটির সমন্বয়ে FOSIS গঠিত। প্রতি বছরই এরা বার্ষিক সম্মেলন করে থাকে। এসব সম্মেলন সাধারণত দুই থেকে তিন দিন স্থায়ী হয় এবং ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইসলামিক পলিটিক্যাল সিস্টেম সম্পর্কে বক্তৃতার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। ৪৫ মিনিট বক্তব্য রাখি এবং ১৫ মিনিট শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দিই।

৯ আগস্ট UMO (United Muslim Organisation) লন্ডনে এক হোটেলের মিলনায়তনে সম্মেলনের আয়োজন করে। অতিথি বক্তা হিসেবে আমিও সেখানে আধঘণ্টা বক্তব্য রাখি। সকল বক্তব্যেরই মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'মুসলিম উম্মাহর ঐক্য'। ২৩ থেকে ২৫

আগস্ট Leicester-এ ইউ.কে. ইসলামিক মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে আমি অতিথি বক্তা হিসেবে যোগদান করি। লিস্টার লন্ডন থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ন নামে একটি বহুমুখী ইসলামী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসেই এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের অন্যতম নায়েবে আমীর এবং মাওলানা মওদূদী (র) প্রতিষ্ঠিত মাসিক 'তরজুমানুল কুরআন্ন পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক প্রফেসর খুরশিদ আহমদের উদ্যোগে এ বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এ প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসেই অনেক ইসলামী সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইউ.কে. ইসলামিক মিশন ষাটের দশকে পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম উদ্যোক্তা পূর্ব-পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাওলানা কুরবান আলী, যিনি তখন লন্ডনে ব্যারিস্টারি কোর্সে অধ্যয়নরত। ইউ. কে. ইসলামিক মিশনের উক্ত সম্মেলনে পূর্ণ তিন দিনই আমি উপস্থিত ছিলাম। অতিথি বক্তা হিসেবে একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখা ছাড়াও সম্মেলনের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডে আমি শরীক ছিলাম। সম্মেলনের অধিকাংশ ডেলিগেট পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রসংঘের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনের মতোই ঐ সম্মেলনের তৎপরতা দেখা যায়।

১৯৭৫ সালের আগস্ট বিপবের লক্ষ্য

১৯৭৫ সালের ঘটনাবলি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আরও কিছু লেখার প্রয়োজন অনুভব করছি। কারণ আগস্ট বিপব বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আদর্শিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এর ফলে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে একটি সেক্যুলার ও সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে যেভাবে গড়তে চেয়েছিল তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে 'বাকশাল' নামে যে একনায়কত্ব কায়েম করা হয়েছিল তাও উৎখাত হয়ে যায়। জনগণের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের ভাবমর্যাদা জনগণের মন থেকে একদম মুছে যায়। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা এত কমে যায় যে, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কোন নির্বাচনেই জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন করেনি। আমার এ ধারণাই ছিল যে, আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দলকে জনগণ ভবিষ্যতেও ক্ষমতায় আসতে দেবে না। যদি এ অবস্থা বহাল থাকত তাহলে ১৯৭৫ সালের আলোচনা এখানে সমাপ্ত করা যেত।

কিন্তু ১৯৯১ সালে প্রথম কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করায় কেয়ারটেকার সরকার দাবিতে আওয়ামী লীগ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে দলকে এতটা অগ্রসর করতে সক্ষম হয় যে, ১৯৯৬ সালের জুনের সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থনে ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ পায়।

আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর ক্ষমতাসীন থাকাকালে আগস্ট বিপবের ফলে যে আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, সে ধারা পরিবর্তন করে দেশকে বিপরীত